আঁচলে আঁচলে রূপকথা

সৌমিত্র হালদার

'মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি—
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো,
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।'

শাড়ি পরলে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। পোশাকের সাথে মনের নিভৃত ইচ্ছেরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পোষাক শুধু আচ্ছাদনের জন্য নয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেও পোশাকের প্রয়োজন হয়। এছাড়া পোষাক জলবায়ু, লিঙ্গ, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালীন পোষাক শীতকালীন পোশাক থেকে ভিন্ন। ব্যক্তিগত অভিরুচি ছাড়াও স্থান-কাল পোষাক পরিচ্ছদকে প্রভাবিত করে। সুখের সময় মানুষ যে পোষাক পরে, শোকের সময় তা পরে না। রাত্রিতে যে পোষাক পরে ঘুমোতে যায়, সে পোষাক পরে উৎসবের আমেজ আসে না। পুলিশ, মিলিটারির ড্রেসকোড বিভিন্ন। এছাড়া সাঁতার কাটা এবং খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের পোষাক ব্যবহৃত হয়। কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ও ছাত্রছাত্রীদের পোষাকও সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাচীন গুহাবাসী মানুষ গাছের ছাল ও পাতার পোষাক পরত। সভ্যতার বিবর্তনের ফলে পোষাকের পরিবর্তন হয়। এই বিবর্তনের পেছনে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে গেরুয়াবসন পরেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। আবার খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও বিশেষ ধরনের সাদা পোষাক পরেন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে মুসলিম মহিলারা বোরখা পরেন।

পোষাকের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত আছে। প্রযুক্তি শিল্প, দক্ষতা ও বৈচিত্র্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য পৃথিবীর কাছে ঈর্ষনীয়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ মসলিন, জমকালো বুনোনের রংবাহারি কলমকারি মানুষকে মুগ্ধ করেছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে অন্যান্য সংস্কৃতির থেকে আহৃত বিভিন্ন সৌন্দর্যবোধের আত্তিকরণের ফলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। আবার বিদেশি প্রকরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়নশিল্পের পরিশীলন ও উন্নতি ঘটিয়েছে।

হরপ্পায় প্রাপ্ত ভারতীয় সুতিবস্ত্রখণ্ডটি প্রমাণ করে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীরা প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সুতিবস্ত্র বুননের সাথে রং পাকা করার উপায় জানতেন। সারা পৃথিবীতে বিশেষত রোম ও চীনে ভারতীয় সুতিবস্ত্রের চাহিদা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হেরোডেটাসকে মুগ্ধ করেছিল বয়নশিল্প। অত্যন্ত মিহি মসলিনের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'নেবুলা-ভেল্টি'। কবি সত্যেন দত্ত উচ্ছ্বাসে লেখেন—

'বাঙলার মসলিম বাগদাদ রোম চিন;
কাঞ্চন তৌলেও কিনতেন একদিন।'

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে হান্ যুগে চীনের সাথে ভারতের চীনাসিল্কের বাণিজ্য চলত। মহাভারত ও মনুসংহিতায় উপহার হিসাবে সিনামুখ বা চিনাসিল্কের উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে এবং বানভট্টের 'হর্ষচরিতে' চিনাসিল্কের কথা পাওয়া যায়।

দশম শতাব্দীতে আরব ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য শুরু করে। ফলে আরবের সংস্কৃতি ভারতীয় কৃষ্টির সাথে মিশে যায়। এই সময় ধর্মাচরণের জন্য শুদ্ধ কাপড় তৈরির কারখানা এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে। সম্ভবত 'মশরু' বোনা হয়েছিল এমনভাবে যাতে তার বাইরের দিকটা ছিল রেশমি এবং ভিতরের দিকটা ছিল সুতিবস্ত্র। ধর্মপ্রাণ মুসলমান রেশমি বস্ত্র পরতে পারতেন না যা তাঁর ত্বকের সংস্পর্শে আসে। নকশাকাটা মশরু পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকাতে রপ্তানি করতেন বয়নশিল্পীরা। ত্রয়োদশ শতকে মধ্যএশিয়া থেকে আগত আরেকটি বুনন কৌশল আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এটা প্রবর্তন করেছিল বোখরা থেকে আগত নকশাবন্দরা। নকশাবন্দের গোষ্ঠীরা সুরাট থেকে অন্ধ্র, বারানসী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতকে ইবনবতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং মোঘল লিপিকারদের রচনা থেকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া রাজস্থানের রাজবাড়ির নথিপত্র ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দলিল দস্তাবেজ থেকেও এর সাক্ষ্য মেলে।

সুতি মসলিন বা মলমলকে পৃথিবীর বস্ত্রশিল্পে প্রাচীনসভ্যতার এক মহৎদান বলে গণ্য করা হয়। ভারতের প্রবল গ্রীষ্ম ও চড়া আলোর উপযোগী এই বস্ত্রর নাম মরুৎবস্ত্র বা প্রভাত শিশির। মলমলের মান নির্ভর করত সুতোর মান ও তন্তুজশিল্পের দক্ষতার উপর। সম্রাট জাহাঙ্গীরের 'মিনিয়েচার' চিত্রে দেখা যায় যে নবাব ও তাঁর পরিজনেরা স্বচ্ছ মসলিনের জামা ও ঘাঘরা পরে আছেন। রাজস্থান ও কাংড়া শিল্পের নিদর্শন থেকে জানা যায় যে কাঁচুলি ও ঘাঘরা ভারতীয় মেয়েদের নিজস্ব পোশাক। উনবিংশ শতকেও গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের নানা গ্রামে, শহরে মসলিন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হতে। বিংশ শতাব্দীর শেষেও সুতোকাটার অসাধারণ দক্ষতা দেখা যায় দক্ষিণবঙ্গের নানা শহরে।

ফুল ও নকশাসম্বলিত সূক্ষ্মসুতি বা মসলিনের তাঁতবস্ত্রের নাম জামদানি। জামদানি কথাটার অর্থ আমাদের কাছে অজানা। বাঁশের ছুঁচ দিয়ে তাঁতশিল্পীরা সুতো ঢুকিয়ে নকশা তৈরি করেন জমির উপর। বাঙলা ও অযোধ্যা ছাড়াও তামিলনাড়ুর তাঞ্জোর, অন্ধ্রের ভেঙ্কটগিরি এবং মহারাষ্ট্রের পৈঠানে এই পদ্ধতিতে সেলাইহীন বস্ত্র উৎপাদন করা হয়েছে। বিত্তবান পরিবারের মেয়েরা বহুমূল্য নালাম্বরী শাড়ি পরতেন। এই নীলাম্বরী বাঙলার শ্রেষ্ঠ জামিদানিগুলির অন্যতম।

কাপড়ের উপর রং দিয়ে চিত্রাঙ্কনের রীতির উল্লেখ আছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে। বৈষ্ণব মন্দিরের বিগ্রহের পিছনে টাঙানো হতো সুতিবস্ত্র পিছবাই। বিশেষ ঋতু বা পূজাপদ্ধতি অনুসারে পটের রং ও শিল্পকলা পাল্টানো হতো। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের নিদর্শনগুলো সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। বিশ্বের বস্ত্রশিল্পের মধ্যে ভারতীয় বস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অবদান হল সুতিবস্ত্রের উজ্জ্বল ও স্থায়ী রং-এর ছাপাই কলমকারি। প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির মধ্যে রুমার চাদর উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতকে মোঘল দরবারের নানা জায়গায় এগুলো ব্যবহৃত হতো। দাক্ষিণাত্যেও কিছু কলমকারির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এশিয়া ও ইউরোপের সমৃদ্ধ সভাকক্ষে এর উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল বাণিজ্যপথে। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও এই বস্ত্র সামগ্রী ব্যবসা একশ বছর ধরে রমরম করে চলেছে।

সুতিবস্ত্রে রং দিয়ে চিত্রণ করার মতো আরও একটি শিল্পকলা পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছিল। সুতো বা

কাপড়ের কিছু অংশ রঙহীন রেখে বাকি অংশকে রঙে ছোপানো। এই পদ্ধতির নাম ইক্কত্। হিন্দু মুসলমান জৈনদের বিভিন্ন উৎসবে এগুলি ব্যবহার হতো। ওড়িশার বয়নশিল্পীরা ইক্কত্ সিল্ক উৎপাদন করত অসাধারণ দক্ষতায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এই বস্ত্র রপ্তানি করা হতো। জয়পুরের কাছে সাংগানেরের ছাপা সুতিবস্ত্র ভারতের সুতিবস্ত্রর জনপ্রিয় ধারাগুলির মধ্যে একটি। অষ্টাদশ শতকে এই শিল্পধারার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মোঘল দরবারে সাংগানেরের নকশায় লিপি ও গোলাপ ফুলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাদের ছাপার সৌন্দর্য আজকের ব্লক ছাপাইয়ের শিল্পীদের কাছে প্রায় অসম্ভব। মোগলযুগে ন্যাচারালিজম এবং আফগান যুগে স্টাইলাইজড নকশার সূত্রপাত ঘটে। ভারতের 'বুটি' বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার হয় এখান থেকে। শ্রীনগরে এখনও বয়শিল্পের এই ধারা অব্যাহত আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের বালুচর বালুচরী শাড়ির জন্মস্থান। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়ার তাঁতিরা এই শাড়ির নির্মাণকৌশল রপ্ত করে উন্নতমানের বালুচরী শাড়ি তৈরি করে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা এই শাড়ির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯০০ সালে বালুচরী শাড়ির বিখ্যাত শিল্পী দুবরাজ দাস-এর শাড়ি প্যারিসে সমাদৃত হয়।

বৈদিক যুগে ওড়না ব্যবহার করা হতো। তখন নাম ছিল কিরীটা, বেষ্টনা প্রভৃতি। এরপর মুসলিম যুগে ওড়না ফিরে আসে। ওড়না ব্যবহার এখনকার মেয়েদের ফ্যাশন। কোন কোন মহিলা দোপাট্টা ব্যবহার করেন। সালোয়ার কামিজ মেয়েদের সববয়সে মানায়। প্রাচীন ভারতে এর নাম ছিল শেরওয়ানি। মুসলিম যুগে সালোয়ার বা চুড়িদার জনপ্রিয়তা লাভ করে। তার আগে আফগানিস্থানে মেয়েরা সালোয়ার বা চুড়িদার পরত। পাঞ্জাব বা গুজরাতের স্টাইলিশ বা রংবাহারি সালেয়ার মেয়েদের মধ্যে জনপ্রিয়।

অতীতে নাকি ছেলেমেয়েদের পোষাক একইরকম ছিল। চতুর্দশ শতকে লিঙ্গভিত্তিক পোষাক চালু হয়। আর ষোড়শ শতকে আমেরিকায় 'ফ্যাশন' শব্দটি প্রচলিত হয়। 'স্কার্ট' আমেরিকার পোষাক। অষ্টাদশ শতকে মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত স্কার্ট পরত। এখনও মেয়েরা স্কার্ট পরে। লংস্কার্ট, কুঁচি স্কার্ট, ওয়েভি স্কার্ট, কখনো বা চোরি চোরি স্কার্ট। আবার শর্টফিটিং ডেনিমস্কার্ট এবং ফ্লেয়ার স্কার্ট ইংল্যাণ্ডের ফ্যাশন।

প্রাচীন ভারতে পোশাকের নাম ছিল অঙ্গরক্ষক, চৌখাস প্রভৃতি। পরে আসে ঘাঘরা চোলি। কখনো বা ছেলেদের পোশাক মেয়েরা পরে। ঊনবিংশ শতকে জিনস্ পরা শুরু করে মেয়েরা। এখন চলছে স্ট্রেট জিনস্, অষ্টাদশ শতকে স্কার্টের সাথে বেল্ট দেওয়া লংটপ মেয়েরা পরত। এখন লংটপ, শর্টটপ, ফ্লেয়ার টপ, হল্টার টপ পরে। ইউথ স্লিভ, স্লিভ লেস টপে দেখা যায় চুমকি, এ্যাপ্রিক ও সিকোয়েন্সের কাজ।

আজকাল লংগাউন খুব জনপ্রিয়। এটাকে জনপ্রিয় করেছেন ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ। এখন তরুণীরা স্লীভলেস গাউন পরে। এছাড়া মেয়েরা এখন নীন-লেনথ কেপ্রি পরছে। কেপ্রি ইউরোপ থেকে আমদানি।

বিদেশ পোশাকের বিচিত্র রং বাহার যতই মুগ্ধ করুক না কেন, শাড়ির গৌরব ও মর্যাদা এতটুকুও কমেনি। পূজা-অর্চনা থেকে শুরু করে উৎসবে, বিষাদে সর্বত্র শাড়ির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। শাড়ি দেশবিদেশের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের কুহু-কেকা সমন্বয়ের বার্তা বহন করে। আসাম সিল্ক, মুগা, জারদৌসি, কাঞ্জিভরম থেকে শুরু করে পশমিয়া, ওড়িশার বোমকাই, রাজস্থানের পাটলিপল্লু, বিষ্ণুপুর, বালুচরির সমান কদর আজও। জুটসিল্কের ঘিচা শাড়ি, তসরের উপর মোঘল ডিজাইন চন্দ্রচূড়

শাড়ি, মছলিপট্টম, মটকা, মিনঞ্জারির নতুন নতুন ডিজাইন মেয়েরা পছন্দ করে। বিভিন্ন সিল্কের উপর বুটিক সহ পারসিক কাজ, কাশ্মীরি কাজ সহজেই মন কেড়ে নেয়। শিফন, জর্জেট ও ক্রেপ যথেষ্ট আরামদায়ক। জরিওয়ার্ক, স্টোনওয়ার্ক করা কাঞ্জিভরম বা ইস্কতে ছোটবড় চেকের রকমারি বাহার সত্যই বিস্ময়কর।

পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে পর্তুগীজরা ভারতে বাণিজ্য শুরু করে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করে ধীরে ধীরে এদেশের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। বস্ত্রবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের আধিপত্য নষ্ট হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতকে ভারতের তাঁতশিল্পে চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে। রাজাবাদশার যুগ শেষ হওয়ার ফলে হস্তচালিত তাঁতশিল্পর পতন ঘটে। শিল্পবিপ্লবের ফলে কলের কাপড়ে দেশ ছেয়ে যায়। ভারতের বস্ত্রশিল্পের উপর করের বোঝা বাড়ে।

স্কটল্যাণ্ড ও প্যারিসে কাশ্মিরী শালের অনুকরণ জনপ্রিয় হতে থাকে। শালব্যবসায়ীরা বিশাল অঙ্কের কর দিতে বাধ্য হয়। কারখানাজাত বস্ত্রশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে এদেশের বয়নশিল্পীদের আর্থিক অবস্থা অবনতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়।

পশ্চিমের পোষাক জনপ্রিয় হওয়া সত্বেও আমাদের দেশের শিল্পকলার যে অস্তিত্ব ছিল তার কারণ আমাদের ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক আচারে মহিলাদের সনাতন বেশভূষা বজায় রাখা। গ্রামে পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব ততটা পড়েনি। বাড়ির প্রয়োজন মেটানো, পূজা অর্চনার জন্য রেশমি কাপড় এবং বিয়ের শাড়ির প্রচলন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পর ঐতিহ্য রক্ষা করেছিল।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বদেশি আন্দোলন ভারতীয় দের মনে দেশজ শিল্পের প্রতি গর্ব জাগিয়ে তুলেছিল। বিদেশি বস্ত্র বয়কট করার ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পর বিকাশ ত্বরান্বিত হলো। হাতে বোনা খাদি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫২ সালে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দেশবিদেশে সমাদৃত হতে থাকে। ভারত সরকার তাঁতবস্ত্র রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করে।

ভারতীয় মহিলারা সূচিশিল্পের যে নমুনা তৈরি করেছিল, তা ছিল তাদের সৃজনশীলতার এক অসাধারণ নিদর্শন। মিশনারিদের সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাগুলির সংস্পর্শে সনাতন সূচিশিল্প মার খেয়েছিল। মিশনারিরা পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশি নকশা জনপ্রিয় করেছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙলায় নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। সমাজ সংস্কার ও নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। ঠাকুরবাড়িতে শাড়ি পরার ধরণ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নারীচরিত্র তথা বঙ্গনারীর আধুনিকতা মধ্যবিত্ত মহলে অনুকরণের আদর্শ হয়ে উঠেছিল।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়াশুনা শুরু করতে থাকে। চাকুরি বা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত হয়। পারিবারিক ও সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ষাটের দশকে আমেরিকায় নারী আন্দোলন শুরু হয়। দেশে বিদেশে মেয়েরা নারী স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে থাকে। এমনকি আটের দশক থেকে মুসলিম মেয়েরাও মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। কখনো সে আন্দোলন হিংসাত্মক রূপও নেয়।

ষাটের দশকের শেষ দিকে ভারতীয় মহিলাদের পোষাকের ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয় চলচ্চিত্রের হাত ধরে। 'ববি', 'জুলি' প্রভৃতি ছবিতে নায়িকাদের ছোট পোশাক পরতে দেখা যায়। তারপর থেকে হিন্দি ছবির পরিচালকরা নায়িকাদের ছোট পোশাক পরাতে শুরু করেন। বিজ্ঞাপনে মেয়েদের

স্বল্পবাস পরিয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। টিভি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে ফ্যাশন শোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফ্যাশন ডিজাইনাররা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পোশাক আমদানি করেন। মধ্যবিত্তের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ার ফলে দেশবিদেশের পোশাকের চাহিদা বাড়ে। মেয়েরা চাকুরি বা ব্যবসার সুবাদে সামাজিক বাধা অতিক্রম করে পোষাকের অধিকার অর্জন করে। অফিস, ফ্যাক্টরির ড্রেস কোড এবং যানবাহনে চলার সুবিধার্থে মেয়েরা জিন্‌স, টি-শার্ট, সালোয়ার পরা শুরু করে।

নব্বই-এর দশক থেকে সরকার বিশ্বায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। বিদেশি পোশাক যেমন ভারতে আমদানি হয়, তেমনি বিদেশে ভারতীয় পোশাকও রপ্তানি হতে থাকে। শাড়ি বা সালোয়ারের পাশাপাশি ভারতীয় মেয়েরা পাশ্চাত্য পোশাককে আত্মস্থ করে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর মেলবন্ধন ঘটেছে প্রাচীন কালেই। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ববাণিজ্য এক নতুন মাত্রা পায়। বাণিজ্য ও বিজ্ঞাপনের ধরণ পালটে যায়। পোশাক তার থেকে মুক্ত থাকেনি। পোশাকের সাথে সাথে অনেক অনুষঙ্গ এসে গেছে। বর্তমানে হেয়ার স্টাইল, ত্বকচর্চা, অলংকার, প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার সবকিছুর সাথে খাপ খাইয়ে পোশাক পরিচ্ছদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম ছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও মেয়েদের পোশাককে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মনিপুরি মেয়েদের জন্য শুধু মনিপুরি পোশাক পরার ফতোয়া জারি করতে চাইছে মনিপুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। মুসলিম ধর্মীয় আইন মেয়েদের জন্য ইসলামি পোশাক বলবৎ করার নির্দেশ জারি করেছে। পুরুষের হাতে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চলচ্চিত্রে বিজ্ঞাপনে, প্রেমের গল্পে মেয়েদের ছোট পোষাক পরানোর বন্দোবস্ত পাকা করা হয়েছে। আধুনিক মেয়েরা দেশের পোশাক ত্যাগ করেনি। জিনস্ বা টপের পাশাপাশি শাড়ি ও সালোয়ার সমানে চলছে। বেহায়া শাড়ির আঁচলে প্রেমিকের হাসনুহানা হাসি, বুকে জমে ওঠে লক্ষ প্রজাপতির ভীড়। শরীরের ভাঁজ শাড়ির আঁচল যতটুকু ঢাকা পরে তাতেই দেখা ও না দেখার মায়ায় 'সেক্স এ্যাপিল' তৈরি হয়। সিফনজর্জেট পরা কোন সুন্দরীর এক ঝলক হাসির দাম লাখ টাকা। সেখানে শ্লীল-অশ্লীল শব্দগুলি অর্থহীন। পোশাকের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য নির্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত। মেয়েদের পোশাককে অযাচিত নিয়ন্ত্রণ কোন কাজের কথা নয়। পোশাকের অধিকার সকলেরই থাকা উচিত।

ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ বস্ত্রশিল্পর ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। দরিদ্র মানুষ এই ধারা থেকে বহুকাল ধরেই বিচ্ছিন্ন। সাধারণ দরিদ্র মানুষ লজ্জা নিবারণের সামান্য আচ্ছাদনটুকু যোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যান। তাদের কাছে বস্ত্র সংস্কৃতি প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। সাম্প্রতিককালে শিশু শ্রমিকের দোহাই দিয়ে আমেরিকা ভারত থেকে বস্ত্র আমদানি বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে। যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে তারা কাজ করতে বাধ্য হয়। তাদের শৈশব চুরি করে মুনাফার পাহাড় জমে। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার উপচে পড়ে। তাদের রক্তে ও ঘামে ভোরের আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করে। বোবা কান্নায় ভিজে যায় না-দেখা মায়েদের শাড়ির আঁচল। আঁচলে আঁচলে অপার আনন্দ ম্লান হয়ে আসে।

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন পত্রপত্রিকা।